গল্প

মন্দির

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

মন্দির

এক

এক গ্রামে নদীর তীরে দু’ ঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটি তুলিয়া ছাঁচে ফেলিয়া পুতুল তৈরি করিত, আর হাটে বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটির পুতুল তাহাদিগের পরনের বস্ত্র ও উদরের অন্ন যোগাইয়া থাকে। মেয়েরা কাজ করে, জল তুলে, রাঁধিয়া স্বামী-পুত্রকে খাওয়ায় এবং নিবান ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুম্ভকার-পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট ক্ষীণদেহ এই ব্রাহ্মণকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খেলাধূলা, লেখাপড়া সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটির পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে বাঁশের ছুরি ধুইয়া দিত, ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটি চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্টচিত্তে পুতুলের চিত্রাঙ্কন-কার্য কেমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে, তাহাই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত। কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, সরকারদাদা, অমন তাচ্ছিল্য করে আঁকচ কেন? সরকারদাদা অর্থাৎ কারিগর সস্নেহে হাসিয়া জবাব দিত, বামুনঠাকুর, ভাল করে আঁকতে গেলে বেশি দাম লাগে, অত কে দেবে বল? এক পয়সার পুতুল ত আর চার পয়সার বিকোবে না!

দুই

এ সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বুঝিয়াছিল। এক পয়সার পুতুল ঠিক পয়সায় বিকাইবে, তাহার ভ্রূ থাকুক, আধখানা ভ্রূ নাই থাকুক। দুই চক্ষু সমান অসমান যাই হউক, সেই এক পয়সা! মিছামিছি কে এত পরিশ্রম করিবে? পুতুল কিনিবে বালক, দু'দণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে—তার পর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত?

শক্তিনাথ বাটী হইতে সকালবেলা যে মুড়িমুড়কি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া অতিশয় অন্যমনস্কভাবে চিবাইতে চিবাইতে ছড়াইতে ছড়াইতে সে তাহাদের জীর্ণ বাটীর প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। বাটীতে কেহ নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা জমিদারবাটীতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলোচাল, কলা, মূলা প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিবেন, তাহার পর পাক করিয়া পুত্রকে খাওয়াইবেন, নিজেও খাইবেন। বাড়ির উঠান কুঁদফুল, করবীফুল ও শেফালীফুলগাছে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মীহীন বাটীটার সর্বত্রই জঙ্গল; কিছুতে শৃঙ্খলা নাই, কাহারো পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মধুসূদন কোনরূপে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ ফুল পাড়িয়া, ডাল নাড়িয়া, পাতা ছিঁড়িয়া উঠানময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রতিদিন সকালবেলা শক্তিনাথ কুমোর-বাড়ি যায়। আজকাল সে পুতুলে রং দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সরকারদাদা সযত্নে সবচেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর। দাদাঠাকুর একবেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয়ত খুব ভালই হয়, তবু এক পয়সার বেশি দাম উঠে না। সরকারদাদা কিন্তু বাটী আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের চিত্রি-করা পুতুলটি দু'পয়সায় বিকিয়েচে। শুনিয়া শক্তিনাথের আর আনন্দ ধরে না।

তিন

এ গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেবদ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষনির্মিত মদনমোহন-বিগ্রহ; পার্শ্বে সুবর্ণরঞ্জিত শ্রীরাধা—অত্যুচ্চ মন্দিরে রৌপ্য-সিংহাসনে তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন। উপরে কিংখাপের চন্দ্রাতপ, তাহাতে শতশাখার ঝাড় দুলিতেছে। এক পার্শ্বে মর্মর-বেদীর উপর উপকরণ সজ্জিত, এবং নিত্যনিবেদিত পুষ্প-চন্দনের ঘনসৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বুঝি, স্বর্গসুখ ও সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে এই পুষ্প ও গন্ধ পূজার প্রথম উপচার হইয়া আছে, এবং তাহারই সুকোমল সুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মন্দিরবায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

চার

অনেকদিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারায়ণবাবু যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়া প্রথম বুঝিলেন যে, এ জীবনের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, যেদিন সর্বপ্রথম বুঝিলেন, যে এ জমিদারি ও ধন-ঐশ্বর্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, প্রথম যেদিন মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখ দিয়া অনুতাপাশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, আমি সেইদিনের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার একমাত্র কন্যা অপর্ণা—পাঁচ বৎসরের বালিকা। পিতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া একমনে সে দেখিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য চন্দন দিয়া কালো পুতুলটি চর্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেষ্টন করিতেছেন এবং তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ আশীর্বাদের মত যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিতেছে। সেইদিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর পিতার সহিত ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল-উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে—ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটি যে তাহারও বক্ষ-শোণিতের মত, এ কথা সে তাহার সমস্ত কর্ম ও খেলাধূলার

মধ্যেও প্রমাণ করিতে বসিল। সমস্ত দিন এই মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুষ্ক তৃণ বা একটি শুষ্ক ফলও সে মন্দিরের ভিতরে পড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সযতনে আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া লইত। রাজনারায়ণবাবুর দেবনিষ্ঠা—লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিত, কিন্তু অপর্ণার দেবসেবাপরায়ণতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফুল আঁটে না—একটা বড় আসিয়াছে। চন্দনের পুরাতন বাটিটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোজ্য ও নৈবেদ্যর বরাদ্দ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নিখুঁত বন্দোবস্তের মাঝে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারায়ণবাবু এ-সব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি-স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, ঠাকুর আমার ঘরে তাঁহার নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তোমরা কেহ কিছু বলিয়ো না।

পাঁচ

যথাসময়ে অর্পণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ বুকে চাপিয়া বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেমন অবরুদ্ধ গৌরবের গুরুভারে স্থির হইয়া কিছুক্ষণ আকাশের গায়ে বর্ষণোন্মুখভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা শুনিল যে, সেই দেখান-দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, বাবা, আমি ঠাকুরসেবার যে বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, তাহার যেন অন্যথা না হয়। বৃদ্ধ পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাই ত মা! না, অন্যথা কিছুই হবে না।

অপর্ণা নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই। সে কাঁদিতে পারিল না। বৃদ্ধ পিতার দু'চোখ-ভরা জল, সে রোধ করিবে কি করিয়া? তাহার পর, যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার ব্যথিত ক্রন্দনোন্মুখ বীর-হৃদয় পৌরুষ-শুষ্ক হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণপূর্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে

গিয়া তাহার মনে পড়িল—পিতার অশ্রু মুছাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত ব্যথায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন্ গ্রামান্তরে মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম-পরিচিত আরতির আহ্বান-শব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মর্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। ছটফট করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, এবং ছায়া-নিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু-শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের সমুন্নত চূড়া কল্পনা করিয়া সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর-বাটীর একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, ছি বৌমা, অমন করে কি কাঁদতে আছে মা, শ্বশুর-ঘর কে না করে? অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পালকির কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়টিতেই মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপধুনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

ছয়

অপর্ণা স্বামীগৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাহীন স্বামী-সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ, এতটুকু চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রণয়ের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উত্তেজনা, কিছুই তাহার ম্লান চক্ষু দুটির পূর্বদীপ্তি ফিরাইয়া আনিল না। প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুর্বোধ্য অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল এবং তাহারই ক্ষুব্ধ বেদনা কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিতা তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক রাত্রে অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, অপর্ণা, তোমার এখানে থাকতে কি ভাল লাগে না?

অপর্ণা জগিয়া ছিল, বলিল, না।

বাপের বাড়ি যাবে?

যাব।

কাল যেতে চাও?

চাই।

ক্ষুব্ধ অমরনাথ জবাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আর যদি যাওয়া না হয়?

অপর্ণা কহিল, তা হলে যেমন আছি তেমনি থাকব।

আবার কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া থাকিল; অমরনাথ ডাকিল, অপর্ণা!

অপর্ণা অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি!

আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন নাই?

অপর্ণা গায়ের কাপড়চোপড় সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া স্বছন্দে শুইয়া বলিল, ও-সব কথায় বড় ঝগড়া হয়, ও-সব ব'লো না।

ঝগড়া হয়—কি করে জানলে?

জানি, আমাদের বাপের বাড়িতে মেজদা ও মেজবৌ এই নিয়ে নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া-কলহ ভাল লাগে না।

শুনিয়া অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন খুঁজিতেছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল, বলিয়া উঠিল, এস অপর্ণা, আমরাও ঝগড়া করি! এমন করে থাকার চেয়ে ঝগড়া-কলহ ঢের ভাল।

অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, ছি, ঝগড়া কেন করতে যাবে? তুমি ঘুমোও।

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুঝিতে পারিল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজকর্ম ও জপে-তপে কাটিয়া যায়। এতটুকু রঙ্গরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করে না, দেখিয়া তাহার সমবয়সীরা বিদ্রূপ করিয়া কত কি বলে, ননদেরা 'গোঁসাই ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলা মিছা কাটিয়া যাইতেছে।

আর এই অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিত-বিন্দু সেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির-অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে-উপকূলে অহরহ আছড়াইয়া পড়িতেছে,—তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘরকন্নার কাজে না ছোটখাট হাস্য-পরিহাসে? ক্ষুব্ধ-অসুস্থচিত্ত তাহার এই যে বিপুল ভ্রান্তি মাথায় করিয়া আপনা-আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর আদর ও স্নেহ, পরিজনবর্গের প্রীতি-সম্ভাষণ ঘেঁষিবে কি করিয়া? কি করিয়া সে বুঝিবে, কুমারীর দেবসেবা দ্বারা নারীত্বের কর্তব্যের সবটুকু পরিসর পরিপূর্ণ করা যায় না?

সাত

অমরনাথের বুঝিবার ভুল—সে উপহার লইয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেলা তখন নটা-দশটা। স্নানান্তে অপর্ণা পূজা করিতে যাইতেছিল। গলার স্বর যতটা সম্ভব মধুর করিয়া অমর কহিল, অপর্ণা, তোমার জন্য কিছু উপহার এনেচি, দয়া করে নেবে কি?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল, নেব বৈ কি!

অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে শৌখিন রুমালে বাঁধা একটা বাক্সর ডালা খুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোনার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, মানুষ কাচের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ একনিমিষে নিবিয়া গিয়া যেন অর্থহীন এক ফোঁটা শুষ্ক হাসির মাঝে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতে চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটা-কতক কুন্তলীনের শিশি, আরো কি কি বাহির করিতে উদ্যত হইল, অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, এনেচ কি আমার জন্য?

অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল, হাঁ, তোমার জন্যই এনেচি। দেলখোসগুলো—

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, বাক্সটাও কি আমাকে দিলে?

নিশ্চয়ই।

তবে আর কেন মিছে ও-সব বের করবে, বাক্সতেই থাক।

তা থাক। তুমি ব্যবহার করবে ত?

অকস্মাৎ অপর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সমস্ত দুনিয়ার সহিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষত বিক্ষত হৃদয় পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণপূর্বক নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সহসা তাহার গায়ে এই স্নেহের অনুরোধ কুৎসিত বিদ্রূপের আঘাত করিল; চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিঘাত করিল, বলিল, নষ্ট হবে না, রেখে দাও। আমি ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করতে জানে। এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। আর অমরনাথ,–বিহ্বলের মত সেই প্রত্যাখাত উপহারের উপর হস্ত রাখিয়া সেইভাবেই বসিয়া রহিল। প্রথমে সে সহস্রবার মনে মনে আপনাকে নির্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিল। বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অপর্ণা পাষাণী। তাহার চোখ জলে ভাসিয়া আসিল–সেইখানে বসিয়া একভাবে ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখান করিত, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। সে যে প্রত্যাখান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি করিয়া করিবে? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং সর্বসমক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবে যে, সে তাহার মুখ আর দেখিবে না। সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে, হয়ত ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয়ত অপর্ণার কোন দারুণ দুর্দিনের দিনে অকস্মাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমনি সম্ভব ও অসম্ভব কতরকম উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাদ-প্রতিবাদ তাহার অপমানপীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধীরতার আলোড়ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল, এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সঙ্কল্পের সুদীর্ঘ তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

আট

তাহার পর দুই দিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া বধূকে ডাকিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনা করিলেন, পুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন; দিদিশাশুড়ি এই সূত্রে একটু রঙ্গ করিয়া লইলেন। এমনি সাতে-পাঁচে ব্যাপারটা লঘু হইয়া গেল।

রাত্রে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল যদি মনে কষ্ট দিয়ে থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।

অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া বিছানার চাদর বার বার টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সম্মুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি। সে আবার কহিল, ক্ষমা করবে না?

অমরনাথ মুখ নিচু করিয়াই বলিল, ক্ষমা কিসের জন্য? ক্ষমা করবার অধিকারই বা আমার কি?

অপর্ণা স্বামীর দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিল, ও-কথা ব'লো না। তুমি স্বামী, তুমি রাগ করে থাকলে কি আমার চলে? তুমি ক্ষমা না করলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কেন রাগ করেচ, বল।

অমরনাথ আর্দ্র হইয়া কহিল, রাগ ত করি নাই!

কর নাই ত?

না। অপর্ণা কলহ ভালবাসিত না; বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, তাই ভাল। তাহার পর নিতান্ত নির্ভাবনায় বিছানার এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবলই সে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস করিল কি করিয়া! সে যে দু'দিন আসে নাই, দেখা করে নাই, তথাপি সে রাগ করে নাই—এটা কি বিশ্বাস করিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মিটিয়া সব বৃথা হইয়া গেল? তাহার পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিয়া বসিল এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল, অপর্ণা, তুমি বুঝি ঘুমুচ্চো? ও অপর্ণা!

অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, ডাকচ?

হ্যাঁ—কাল আমি কলকাতায় যাব।

কৈ, সে কথা ত আগে শুনি নাই! এত শীঘ্র তোমার কলেজের ছুটি ফুরোল? আরো দু'দিন থাকতে পার না?

না; আর থাকা হয় না।

অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার উপর রাগ করে যাচ্চ?

ইহা যে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে-কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার যেন কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর্ণার সম্ভ্রম হানি করিয়া বসে; এমনি করিয়া কৌতুহল-বিমুখ নারীর নিশ্চেষ্টতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বামিত্বের যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সেটুকু এই চার-পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন্ সাহসে?

অপর্ণা আবার বলিল, রাগ করে কোথাও যেয়ো না। তা হলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগবে।

অমরনাথ মিথ্যা ও সত্যে যাহা বানাইয়া বলিতে পারিল—তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই এবং তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ সে আরো দুই দিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলও তাই। কিন্তু কাঁদিয়া জয়ী হইবার একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি লইয়া বাড়িতে থাকিল।

নয়

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধে আছে—তাহাতে আকাশ নির্মল হয়। কিন্তু টিপিটিপি বৃষ্টিতে মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দিকে নিরানন্দময় ভাব বাড়িয়া উঠে। বাড়ি হইতে যে কাদা মাখিয়া অমরনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও সে বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তার পূর্বপরিচিত যে-সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে এই পঙ্কিল পা দু'খানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না পায় আমোদ-আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানেও থাকিতে

ইচ্ছা করে না, বাড়ি যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। সমস্ত বুকের উপর তাহার যেন দুর্বহ যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বক্ষপঞ্জর পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা।

এমনি অন্তর্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না। অমরনাথও যে ঠিক এমনিটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এ সময়ে স্বভাবতঃই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না। কেবল ঔষধ-পথ্য আর ডাক্তার-বৈদ্য! অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল—অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বুঝি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্য সত্যই রাজনারায়ণবাবু বালকদের মত ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছেন। পিতার দেখাদেখি সেও এবার ঘরের ভিতর লুটিয়া পড়িল; অশ্রু-প্রবাহ মাটি ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন, মা! অপর্ণা!

অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল, বাবা!

তোর মদনমোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেচে মা!

চল বাবা, যাই।

তোর যে সেখানে সব কাজ পড়ে আছে মা!

চল বাবা, বাড়ি যাই।

চল মা চল। পিতা স্নেহে মস্তক চুম্বন করিলেন, বুক দিয়া সর্ব দুঃখ মুছিয়া লইলেন এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, ওই মা তোমার মন্দির! ওই তোমার মদনমোহন! নিরাভরণা অপর্ণার বৈধব্য-বেশে তাহাকে আর একরকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রুক্ষ কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভারি বিশ্বাস করিল, ভাবিল, দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরের মুখে যেন তাই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতগুণ সৌরভ। নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচ্চে এইরূপ মনে হইল!

যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তাহার অক্ষয়স্বর্গ কামনা করিল।

দশ

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন্ রং বেশি মানাইবে এই তাহার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয়, এ-সব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনাকে আপনি প্রমোশন দিয়া, সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। তবু তাহার পিতা তাহাকে আদেশ করিলেন, শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বেড়েচে, জমিদার-বাটীতে গিয়ে তুমি পূজা করে এস।

শক্তিনাথ বলিল, এখন ঠাকুর গড়চি।

বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, ছেলেখেলা এখন থাক বাবা, কাজ সেরে এস।

পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইল না—তবু উঠিতে হইল। পিতার আদেশে স্নান করিয়া, চাদর ও গামছা কাঁধে ফেলিয়া দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্বেও সে কয়েকবার এ মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্প-গন্ধ, এত ধূপধুনার আড়ম্বর, ভোজ্য ও নৈবেদ্যের এত বাহুল্য। তার ভারি

ভাবনা হইল, এত লইয়া সে কি করিবে? কিরুপে কাহার পূজা করিবে? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এতদিন কোথায় ছিল?

অপর্ণা কহিল, তুমি কি ভট্টাচার্যমশায়ের ছেলে?

১১০০

শক্তিনাথ বলিল, হ্যাঁ।

তবে পা ধুয়ে পূজা করতে ব' স।

পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই, বিশ্বাসও নাই—শুধু ভাবিতে লাগিল, এ কে, কেন এত রূপ, কিজন্য বসিয়া আছে ইত্যাদি। পূজার পদ্ধতি ওলট-পালট হইতে লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনো ফুল ফেলিয়া, নৈবেদ্যের উপর জল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নুতন পুরোহিতটি যে পূজার কেবল ভান করিতেছে মাত্র, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া এ-সব ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবে কি করিয়া? পূজাবসানে কঠিনস্বরে অপর্ণা কহিল, তুমি বামুনের ছেলে, অথচ পূজা করতে জান না!

শক্তিনাথ বলিল, জানি।

ছাই জান!

শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, ঠাকুর, এ-সব বেঁধে নিয়ে যাও—কিন্তু কাল আর এসো না। তোমার বাবা আরোগ্য হলে তিনি আসবেন। অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বাঁধিয়া তাহাকে বিদায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নুতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

এগার

একমাস গত হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ জমিদার রাজনারায়ণবাবুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, আপনি ত সমস্তই জানেন, বড় মন্দিরে বৃহৎ পূজা ভট্টাচার্যের ছেলের দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

রাজনারায়ণবাবু সায় দিয়া বলিলেন, অনেকদিন হ'ল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলেছিল।

আচার্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর করিয়া কহিলেন, তা ত হবেই। তিনি হলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁর কি কিছু অগোচর আছে! জমিদারবাবুরও ঠিক এই বিশ্বাস। আচার্য কহিতে লাগিলেন, পূজা আমিই করি আর যেই করুন ভাল লোক চাই। মধু ভট্টাচার্য যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনিই পূজা করেচেন, এখন তাঁর পুত্রেরই পৌরোহিত্য করা উচিত, কিন্তু সেটা ত মানুষ নয়! কেবল পট আঁকতে পারে, পুতুল গড়তে জানে, পূজা-অর্চনার কিছুই জানে না।

রাজনারায়ণবাবু অনুমতি দিলেন, পূজা আপনি করবেন, তবে অপর্ণাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখব।

পিতার নিকট এ কথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাও কি হয়? বামুনের ছেলে, নিরাশ্রয়, কোথায় তাকে বিদায় করব? যেমন জানে তেমনই পূজা করবে। ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট হবেন।

কন্যার কথায় পিতার চৈতন্য হইল—এতটা আমি ভেবে দেখি নাই। মা, তোমার মন্দির তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই ক'রো, যাকে ইচ্ছা ভার দিয়ো। এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলেন।

অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার ভার দিল। বকুনি খাইয়া অবধি সে আর এদিকে আসে নাই; মধ্যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সে নিজেও রুগ্ন। শুষ্কমুখে তাহার শোক-দুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, তুমি পূজা ক'রো; যা জান তাই

ক'রো, তাতেই ঠাকুর তৃপ্ত হবেন। এমন স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইয়া মন দিয়া পূজা করিতে বসিল।

পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে সে যাহা খাইতে পারে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, বেশ পূজা করেচ। বামুনঠাকুর, তুমি কি হাতে রেঁধে খাও?

কোনদিন রাঁধি, কোনদিন—যেদিন জ্বর হয়, সেদিন আর রাঁধতে পারি না।

তোমার কি কেউ নাই?

না।

শক্তিনাথ চলিয়া গেলে, অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, আহা! দেবতার কাছে যুক্ত করে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, ঠাকুর ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়ো, ছেলেমানুষের দোষ-অপরাধ লইও না। সেইদিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি খায়, কি করে, কি তাহার প্রয়োজন। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেই সেইদিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী, তাহাদের ভক্তি-স্নেহ, ভুল-ভ্রান্তি সব এক করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয়পূর্বক জীবনের বাকি কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহজ অর্থ দেবতাকে বুঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধ-পুষ্প হাত দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলে, বামুনঠাকুর, আজ এমনি করে সিংহাসন সাজাও দেখি, বেশ দেখাবে। এমনি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া আচার্য কহিলেন, ছেলেখেলা হচ্ছে।

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বলিলেন, যা করে হোক মেয়েটা নিজের অবস্থা ভুলে থাকলেই বাঁচি।

বার

থিয়েটারের স্টেজে যেমন পাহাড়-পর্বত। ঝড়-জল এক নিমেষে উড়িয়া গিয়া একটা মস্ত রাজপ্রাসাদ কোথা হইতে আসিয়া জোটে, আর লোকজনের সুখ-সম্পদের মাঝে

দুঃখ-দৈন্যের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়, শক্তিনাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে জাগিয়াছিল, এখন ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, কিংবা নিদ্রায় দুঃখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার ভাল ঠাহর হইত না। তথাপি এই দায়িত্বহীন দেবসেবার সুবর্ণ-শৃঙ্খল যে তাহার সর্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বিক্ষিপ্ত পুতুলগুলা মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত, সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নিজের পূর্ব-স্বাধীনতার কথা ভাবিত; মনে হইত, সে যেন বিকাইয়া গিয়াছে, অপর্ণা তাহাকে কিনিয়াছে। অমনি অপর্ণার স্নেহ ক্রমে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের মামাত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভগিনীর বিবাহ। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাজেই সুখের দিনে ভাগিনেয়কে মনে পড়িয়াছে। যাইতেই হইবে। কলিকাতা যাইবে—কথাটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল। সমস্ত রাত্রি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন মন্দিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল। শক্তিনাথ গিয়া বলিল, আজ আমি কলকাতায় যাব—মামা ডেকে পাঠিয়েচেন—বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, কবে ফিরে আসবে?

শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, মামা আসতে বললেই চলে আসব।

অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য আসিয়া পূজা করিতে বসিলেন। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না, ইচ্ছাও ছিল না।

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েকদিন পরেই বাড়ির জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলো আর যেন কাটিতে চাহে না। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত

ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া রাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, আমি বাড়ি যাব।

মামা নিষেধ করিলেন–সে জঙ্গলে গিয়ে আর কি হবে? এইখানে থেকে লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করে দেবো।

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

মামা কহিলেন, তবে যাও।

বড়বৌ শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কাল বুঝি বাড়ি যাবে?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ যাব।

অপর্ণার জন্য মন কেমন করচে নাকি?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ।

সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয়?

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, খুব যত্ন করে।

বড়বৌ মখ টিপিয়া হাসিলেন; তিনি অপর্ণার কথা পূর্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, তবে ঠাকুরপো, এই দুটি জিনিস নিয়ে যাও; তাকে দিয়ো, সে আরো ভালোবাসবে। বলিয়া তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা দেলখোস শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুইটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিল।

তের

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে সেই শিশি দুইটি বাঁধা আছে–কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না, এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না–তোমার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা হইতে ইহা আনিয়াছি। সুগন্ধে তোমার দেবতা তৃপ্ত হন, তাই তুমিও হইবে।

এইভাবে সাত-আটদিন কাটিল; নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিশি দুইটি লইয়া আসে, নিত্য ফিরাইয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া রাখে। পূর্বের মত একদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে হয়ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেলিত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আজ দুইদিন হইতে তাহার জ্বর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে পূজা করিতে আসে। কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে পীড়ার কথাটাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিত যে দুই দিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ পূজা করিতে আসিতেছে।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, তুমি দু'দিন হতে কিছু খাও নাই কেন?

শক্তিনাথ শুষ্কমুখে কহিল, আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।

জ্বর হয়? তবে স্নান করে পূজা করতে এস কেন? এ কথা বল নাই কেন?

শক্তিনাথের চোখে জল আসিল। মুহূর্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল, তোমার জন্য এনেচি।

আমার জন্য?

হাঁ, তুমি গন্ধ ভালবাস না?

উষ্ণ দুধ যেমন একটুখানি আগুনের তাপ পাইবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্বাঙ্গের রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল; গম্ভীরস্বরে বলিল, দাও। হাতে লইয়া অপর্ণা মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজা-করা ফুল শুকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে শিশি দুইটি নিক্ষেপ করিল। আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন-স্বরে অপর্ণা কহিল, বামুনঠাকুর, তোমার মনে এত! আর তুমি আমার সামনে এসো না, মন্দিরের ছায়াও মাড়িয়ো না। অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দেশ দেখাইয়া বলিল, যাও—

আজ তিন দিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য পূজা করিতে বসিয়াছেন, আবার ম্লানমুখে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ যেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে। পূজা সাঙ্গ করিয়া নৈবেদ্যের রাশি গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্যমহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।

আচার্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, কে মারা গেল?

তুমি বুঝি শোন নাই? কয়েকদিনের জ্বরে শক্তিনাথ, ঐ মধু ভট্টাচার্যের ছেলে আজ সকালবেলা মারা পড়েচে।

অপর্ণা তবুও তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আচার্য দ্বারের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে—দেবতার সঙ্গে কি তামাশা চলে মা!

আচার্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল; সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঠাকুর, এ কার পাপে?

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও। নিজের হাতে আমি কখনও তোমার পূজা করি নাই, আজ করচি—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।